Sunayani

Gargi Bhattacharya

*****

Copyrighted Material

সুনয়নী

ছোট গল্প

গার্গী ভট্টাচার্য

যাদের কথা কেউ বলেনা;

সেইসব মানুষদের।

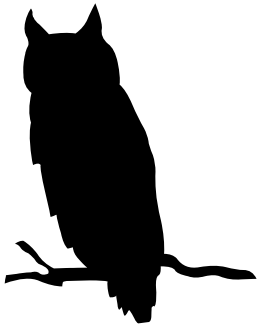

Fiction that adds up, that suggests a 'logical consistency,' or an explanation of some kind, is surely second-rate fiction; for the truth of life is its mystery." ~ **Joyce Carol Oates** in *The Journal of Joyce Carol Oates: 1973-1982*

উত্তর

দুপুর রোদে ; আমি পথে পথে । চিরুয়ান থেকে আমাকে যেতে হবে কেরালা । গাড়িতেই যাবো এরকম স্থির করেছি । দ্বিপ্রাহরিক ভোজনপর্ব শেষ হল সম্বর, রসম্ , ভাত , নারকেল দেওয়া লাউঘন্টি আর দই ভাত ও সুজির হালুয়া দিয়ে । ভরপেট খেয়ে আমি রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছি আমার হোটেল পানে । গাড়ি বলা আছে । সেখানেই আসবে । আমার হোটেলে ভালো খাদ্য মেলেনা বলেই আমি অন্য একটি রেস্তোরাঁতে যাই ।

অসম্ভব গরমে হাঁফিয়ে গিয়ে, এক গাছতলায় বিশ্রামের জন্য দাঁড়াতেই দেখি এক সাধু , সামনে একটি বড় লোহার প্রদীপের মতন জিনিস নিয়ে- ওখানে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে ।মুখে প্রশান্তি । পরণে লাল, দুই টুকরো

কাপড় । গলায় রুদ্রাক্ষ , ঈষৎ ছাই-টাই মেখে রয়েছে । লোহার লম্বা একটা রডের ওপরে প্রদীপের মতন শিখা জ্বলছে । যেই যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে, ওকে প্রণাম ঠুকে কিছু টাকা দিচ্ছে ওর ঝুলিতে । গাছের শীতল ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে এই সাধু । মনে মনে ভাবলাম :: এ কে ? কেন লোকে টাকা দিচ্ছে ?

জানা হলনা । আমি হোটেলে ফিরে এলাম ।

কিছুক্ষণ পরেই আমার গাড়ি এসে গেলো । এবার আমাকে লটবহর নিয়ে উঠে পড়তে হবে । দরোয়ান আমাকে সাহায্য করলো কিঞ্চিৎ । ওকে বেশ কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে গাড়িতে চড়ে বসলাম । কেরালায় ঢুকে খেয়ে নেবো । ওখানে পথের ধারে নারকেলে রান্না করা চিকেন কারি পাওয়া যায়- যা আমার বিশেষ প্রিয় ।

আমি ভোজন রসিক তাই মনে মনে সেই চিকেন ভক্ষণ করতে করতে চলেছি । আমার গাড়ি সেই সাধুকে পাশ কাটিয়ে যেতে আমি চালককে জিজ্ঞেস করে বসি যে এই সাধু কে ? কেন দলে দলে লোকে একে এত টাকা দিচ্ছে ? সারথীকে তাকে চেনে কি ?

গাড়ির ড্রাইভার একচোট হাসলো । হেসে বললো :: ওকে কে না চেনে ? ও সাধু-ফাধু কিছুই নয় । অ্যাফ্রিকা থেকে এসেছে । একটি আশ্রমে ছিলো । সেখানে লোকাল এক সাধ্বীকে দিয়ে, নিজের সারা দেহে চন্দন বাটা লাগাতো-- কালো রং ফর্সা করার জন্য । পরে তাকে চিঠি লেখে যে আমি তোমার ট্যাম্পন্ হয়ে থাকতে চাই ।

সাধ্বী লোকাল মানুষ -তাই হয়ত ট্যাম্পন্ কী তা বোঝেনি । সেই চিঠি নিয়ে মঠের অন্যানদের দেখায় । তার মধ্যে কেউ অধ্যক্ষকে বিষয়টি জানায় ।এই নিয়েই হুলুস্থুল । ওকে মঠ থেকে তাড়ানো হয় । এখন সাধুর বেশে, আশীর্বাদ দেবার ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে থাকে । লোকে, ভিখারী ভেবে পয়সা দেয় । বিদেশী , না খেয়ে মরবে নাকি মহান্ ভারতের মাটিতে ? তাই তার দিনান্তে বেশ ভালই আমদানী হয় । মাঝে মাঝে নাকি হোটেলে গিয়ে বিরিয়ানিও খায় , লোকে দেখেছে ।

চুরি টুরি তো করেনি, তাই কেউ ওর ভিক্ষায় বাধা দেয়না । আমরা ইন্ডিয়ানরা ; আতিথেয়তা করতে অভ্যস্থ । এখানে যত বিদেশী রাজা হানা দিয়েছে, আর লুটপাট করেছে সেরকম মনে হয় আর কোনো দেশে হয়নি ।

ওকে প্রশ্ন করি :: তুমি এত কী করে জানলে ?

ও বলে ওঠে যে ওর বিষয় ছিলো ইতিহাস । হিস্ট্রি অনার্স । পেটের দায়ে, মোটর গাড়ি চালায় । আগে নাকি ডুবাইতে গাড়ি চালাতো ।

সাধুর পুরো গল্প শুনে আমি অবাক হই । বেচারি এসেছিলো সর্বত্যাগী হবে বলে আর হয়ে গেলো ভিখারী ! বয়সের দোষে ; একটু সেক্সি চিঠি লিখে ফেলেছে । আগে জানলে হয়ত আসতোই না এখানে । আমি জানতে চাই যে সে ফিরে গেলোনা কেন তার দেশে ? উত্তর পেলাম যে সেটা কেউ জানেনা । তবে নানান ধারণার মধ্যে একটি হল এই যে সেই মহিলা- যাকে ঐ চিঠি দিয়েছিলো । **হয়ত ওদের অ্যাফেয়ার এখনো জীবিত আছে ; স্পিডে চলেছে , সবার অলক্ষ্যে ।**

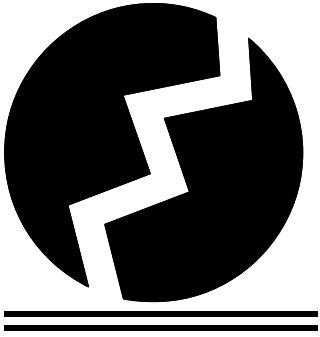

বাঁশি

জগৎপুরে , প্রতিবছর কালীপুজোর আগে একটি মানুষের তৈরি বিরাট মিনারের ওপরে- অর্থাৎ মাথায় একটি শিখা জ্বালানো হয় যাকে বলে দীপালী । এই দীপালী উৎসবে লোকের লাইন পড়ে যায় ঐ শিখা দেখার জন্য । অমাবস্যা রাতে, দূর দূরান্ত থেকে মানুষ আসে, ঐ বিচিত্র শিখা দেখার জন্য । এর নাকি অনেক শুভদিক আছে । মহাভারতের সময় থেকে এই শিখা জ্বলছে । কোন এক মহারথী নাকি এই শিখা প্রথম জ্বালান । পরে- প্রতি পুজোয় পুরোহিতরা জ্বালাতে শুরু করে । আগে একটি স্তম্ভের মাথায় হত । এখন মিনারের ওপরে জ্বলে ওঠে এই পবিত্র অগ্নিচিহ্ন ।

এই শিখা ধরানোর সময় বাঁশি বাজানো , ঢোল ফোল বাজানো ইত্যাদি হয় । মানুষের মধ্যে একধরণের লড়াই

শুরু হয়ে যায়- কে এই শিখা জ্বালানোর সময় বাঁশি বাজাবে তাই নিয়ে ।

রাবণ রচিত, শিব তান্ডব মন্ত্র জপতে জপতে মাকালীর পুজোর উদ্দেশ্যে এই দীপ জ্বালানো হয় জগৎ সংসারের আঁধার কাটানোর জন্য । মানুষের মনের পজিটিভ ভাবনা ও শান্তিকে চারিপাশে ছড়িয়ে দেবার জন্য ।

চন্দন-চর্চিত নিধিরাম ; নাকি বাঁশি বাজানোর ভার পেয়েছে । নিধির ফুসফুসে জখম । চিকিৎসক তাকে বারণ করেছে কোনো নিঃশ্বাস ঘটিত স্ট্রেস নিতে ।

কর্মকর্তারা এসব তথ্য জানতো না । তাছাড়া এসব ধর্মীয় বিষয়ে, অলৌকিক জিনিসের ওপরে লোকে বেশি বিশ্বাস করে । নিধিরামের নাকি বহু বছরের সাধ ছিলো যে সে তার বাঁশিটি , দীপালীর সময় বাজাবে । অন্তত: একটিবার !

দীপালীর সময়, বাঁশি বাজাবার মুন্সীয়ানা দেখাবার ছলে- নিধিরাম উঠে যায় মিনারে । অন্য সবার সাথে । শ্বাস কষ্ট শুরু হয় ,উচ্চতার জন্য । বেজে ওঠে বাঁশরিও । করুণ সুরে ও স্বরে ।

গলা দিয়ে চাপ চাপ রক্ত চলকে পড়ে নিধির ।

একসময় সে ঢলে পড়ে ভীড়ের কোলে, মিনারের চূড়ায় ।

এই হঠাৎ হওয়া দূর্ঘটনার জন্য সেবার দীপালী বন্ধ হয়না, তবে একটু ঝিমিয়ে পড়ে ।

মানুষটিকে আর দেখতে পাবেনা জেনে ওর স্ত্রী -- শকুন্তলা আছাড় খেয়ে পড়ে মাটিতে । তবুও দীপালীর সংগঠকরা এই বলে সুখী ও খুশী হয় যে নিধিরামের মরণের কারণ যাইহোক্ না কেন- সে অলৌকিক কোনো ডাক পেয়েছে তাই এইভাবে মৃত্যুর কোলে নুইয়ে পড়েছে ।

ফুসফুসের অসুখে ; বাঁশি না বাজাবার পরামর্শ যে সে গ্রাহ্য করেনি- সেটাকে তার মূর্খামি না বলে উত্তম বিচার বলা হচ্ছে । নীরবে কাঁদছে হয়ত দীপালীর শিখা -ফসফস্ শব্দে । যেহেতু তার আওয়াজ থাকলেও ভাষা নেই তাই নিধিরামের এইভাবে চলে যাওয়াকে সে সমর্থন করছে- নাকি বিরোধিতা করছে তা বোঝা যায়না । বুঝতে পারেননা- শতবর্ষের পুরোহিত মহাশয়েরাও ।

সারাদেহে চন্দনের প্রলেপ দেওয়া, এই হতভাগা দলিত ছিলো প্রথম এক দলিত-- যে বাঁশি বাজাবার কাজটা পায় । আর নিচুজাতের একমাত্র মানুষ বলেই হয়ত খুশী হয়ে নেয় এই ভার, নিজ স্কন্ধে ।

শেষ নি:শ্বাস তার মিশে যাবে, বাঁশির করুণ সুরের সাথে জেনেই ।

মহাত্মা গান্ধী

কিংশুক সাহা, আগে একটি রসায়ন কারখানায় কাজ করতো। কলকাতার থেকে কিছু দূরে ছিলো তার বাস। দিন আনি, দিন খাই এই যুবকের কাছের মানুষ বলতে কেউ ছিলো না। একটি ভাঙা টিনের ঘরে থাকতো। পেছনে সেই কারখানা !

আইডিয়া কোথায় পেয়েছিলো জানিনা- তবে গান্ধীজীর কথা শুনে শুনে, যে ফাদার অফ্ নেশান আর রং এর টিন নিয়ে কাজ করে করে মাথায় বোধহয় এই চিন্তাটি আসে।

আপাদমস্তক নিজেকে রূপালি রং-এ চুবিয়ে , একটি চশমা পরে- সে গান্ধী সেজে ফুটপাথে বসে। আজকাল

কলকাতায় যায় নদীতে ,ফেরি করে । সেখানে গিয়ে, পোশাক খুলে নিজেই সারাদেহে রূপালি রং মাখে । তারপর গান্ধীর মতন পোজে হয় দাঁড়ায় অথবা হাঁটে ।

কাঁধে থাকে একটি ঝোলা । একটু বেমানান, গান্ধীর সাথে । সেই দড়ি দিয়ে বাঁধা বিগ্‌শপারে, লোকে পয়সা ফেলে দেয় । অনেক ভারী হয়ে গেলে, সেদিনের মতন কিংশুক সাহা কাজ থেকে অবসর নেয় ।

আমি অনেকদিন ধরেই এই নাটক দেখছি । একদিন ওকে প্রশ্ন করলাম যে রসায়নের কাজ করা মানুষটি তো জানে এইসব রং এর বিপদের কথা তাও ফ্যাক্টরি ছেড়ে কেন এই কাজে নামলো ? কেন নিজেকে প্রতিদিন বিষে চোবাচ্ছে ?

কিংশুকের বাবার-- নিজের কারখানা ছিলো ওটা । তার পার্টনার তাকে ঠকিয়ে, ব্যবসা থেকে বার করে দেয় ।বাবা মারা যায় । দু:খে । মা ; ঐ পার্টনারের সঙ্গিনী হয়ে চলে যায় । কিংশুক তখন থেকেই একা । তবে ওকে চাকরি দেয় ওদের মালিক, না জেনেই যে সে তার বাবার ছেলে । কারণ অনেক ছোট বয়সে তার মা, তাকে ত্যাগ করে চলে যায় মালিকের সাথে ।

কিংশুক বলে যে সে আজও মালিকের ক্ষতি করেনি কারণ তার মা, ওর স্ত্রী এখন । এছাড়াও সে এগুলোকে নিজ ভাগ্য বলেই মেনে নিয়েছে । তবে সৎ বাবার ফ্যাক্টরি থেকে, পেটের ভাত যোগাড় করবে না আর বলেই -এই গান্ধী সাজা । একটু ঝুঁকি নিয়েছিলো । সেই ঝুঁকি নেওয়াতে আজ সফল হয়েছে একজন অভিনেতা বা মডেল হিসেবে । তাই অনেক দু:খের মাঝে, এই এক চিলতে সুখকে আঁকড়েই বেঁচে আছে কিংশুক সাহা ।অগ্নিকুন্ডের ; স্বহা স্বহা ধ্বনির মতন ।

চোখটা একটু ছোট করে বলে ওঠে শেষে :: সত্যি কথা বলতে কি- বেঁচে থাকার কোনো কারণ দেখিনা আমি । বঞ্চিত, লাঞ্ছিত আমার এই জীবন ফুরিয়ে গেলেই ভালো । হয়ত এই দেহে, ঐ বিষবৃক্ষ চয়নই আমাকে সাহায্য করবে ওপাড়ে যেতে ।

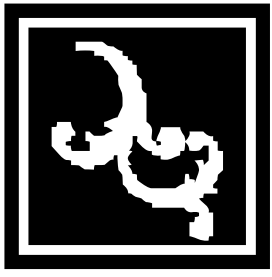

পৃথুলা

শশীশেখর নগরে কেউ মোটা হয়না । ওরা অল্প অল্প খাবার খায় । একবারে বেশি খায়না । ছেলেবেলা থেকে সবাইকে শিক্ষা দেওয়া হয় যে কী খাবে । কতটা খাবে । স্কুলেও এই বিষয়ে ক্লাস হয় । ওরা ভাত কম খায় । চর্বি জাতীয় খাবার কম খায় । হাঁটাহাঁটি করে । ওখানে লিফ্ট কেউ ব্যবহার করেনা । ওদের রাজ্যে মোটা হওয়া এক অভিশাপ । কেউ তার সাথে মেশেনা । সমাজিকভাবে, সে একা হয়ে যায় । তাই কেউ চট্ করে, দেহে মেদ জমানোর ফাঁদে পড়েনা । হয়ত কিছুটা জিনের হাত আছে এই ফিগার মেন্টেন করার ব্যাপারে -তবুও সহজে কেউ মোটা হয়না ।ওখানে মোটা হলে চাকরি যায় ।

মোটা লোকেরা ; ওখানে দায়িত্ব নিয়ে অন্য কোনো মোটাকে- রোগা করে । সরকার ততদিন ওদের পয়সা

দেয় । নিজেও রোগা হবে আর অন্য কাউকে রোগা করবে । মোটা হওয়ার এই শাস্তি , ওখানে ।

অর্ধচন্দ্রর মতন রোগাটে হতে হবে, তবে রোগে আক্রান্ত নয় । হেল্‌থ অনুসারে- সুস্থ থাকা বাঞ্ছনীয় ।

রোহিনী আজকাল বনে থাকে । কারণ মোটা হয়ে পড়াতে তার চাকরি যায় । কী খাবে ভাবলে লোকে বলে সব কাঁচা কাঁচা খেতে । তাতে নাকি স্বাস্থ্য ভালো হবে ।

সরকার থেকে কিছু পয়সা পায় । আর অন্য এক মোটাকে, রোগা করার দায়িত্ব পায় । সে প্রতি সপ্তাহে চারদিন আসে । ট্রেনিং নিতে । জঙ্গলে । রোহিনী একটু বয়স্কা এক নারী , ঈষৎ পৃথুলা । সে একা থাকে ঠিক আছে কিন্তু বনে কেন বাস করে জানতে চায় তার মোটা ছাত্র । জানা যায় যে কাঁচা কাঁচা খাবার খেলে দেহ ভালো থাকে জেনে, সে বোঝে যে---- কিছু কিছু সবজি ,ফলমূল, মধু , দুধ এসব কাঁচা খেলেও মাছ মাংস বা চাল-ডাল কাঁচা খেতে পারবে না । তাই অরণ্যে দিন কাটাচ্ছে ; যতদিন না চর্বি গলে ।

নগরে হেঁটে যায় । আর বেশিরভাগ সময় কাটায় কাঠবেড়ালি, হরিণ , গঙ্গাফড়িং আর পাখিদের ধাওয়া

করে । ওকে নাকি সবাই নিজেদের মনের কথা খুলে বলে । কালো ভ্রমর আর কোকিল , এদিকে মেষশাবক আর গাংচিল সবাই ওর কাছে সমান আদরের । বনেই ভালো আছে । এখন তো মোটা হয়ে গেছে তাই একটু ধীর, স্থির আছে । **হয়ত রোগা হলে উড়েই যাবে । হলুদ পাখির মতন, সোনালি ডানায় লাল নীল হিম মেখে ।**

জাল

মথুরাপ্রসাদ ; ইতিহাস একদমই জানেনা । আর ইংলিশেও পন্ডিত একেবারে । একবার, এক নৌকোয় চেপে -বহুদূরে এক বিদেশী দেশে গিয়ে পৌঁছায় ।

দারিদ্র্য থেকে বাঁচতে, নিজের পূর্বপুরুষের ভিটে ছেড়ে বিদেশে যাওয়া, একপ্রকার প্রাণ হাতে করে এক জিনিস আর সেই দেশে গিয়ে সব সুবিধে থেকে বঞ্চিত হওয়া আরেক জিনিস ।

ঠিক এমনটাই হয়েছিলো মথুরাপ্রসাদের সাথে । বোঁচকা বেঁধে নিয়ে, বিদেশে নৌকো চড়ে গিয়ে দেখে সেখানে সবকিছুই ভিন্ন । এই ভিন্ন দেশে , সরকার থেকে ওদের নানা ট্রেনিং দিতো যাতে তারা মূল সমাজে মিলেমিশে যেতে সক্ষম হয় ।

মথুরাপ্রসাদ , এরকমই এক ট্রেনিং উৎসবে বেশ ভালোরকম ঘা খায় যা তাকে চিরদিনের মতন বঞ্চিত করে নানান সুযোগ থেকে ।

আসলে এক হেমন্তের বিষণ্নতায়, একটি সাদা ফুলের গাছের নিচে বসে থাকা মথুরা শুনতে পায় যে একটু দূরে লোকে মাইক নিয়ে কী যেন বলছে । সে সাদা পাপড়িগুলো ঝেড়ে নিয়ে এগিয়ে যায় ।

কফিপানের ফাঁকে ফাঁকে, লোকেরা নানান কথায় ভাসছে । নানান আলোচনা ভেসে আসে কানে ।

হঠাৎ মাইক নিয়ে, লোকে বলে ওঠে নাৎসি !

কিন্তু নট-সি কেন হবে ? মথুরা তো সবই দেখতে পাচ্ছে । এবং জলের মতন পরিস্কার ! তাই বলে ওঠে :: আই ক্যান ।

আর হাত তুলে দেয় মাথার ওপর । আর তাতেই কাল হয় । ওকে সবাই হিটলারের সমর্থক ভেবে বসে । আর সব সুযোগ পাওয়া থেকে- ওকে বাইরে রাখা হয় ।

ও যেহেতু এরকম এক লোকের সমর্থক ; তাই ওকে দিয়ে আজব কাজ করানো হচ্ছে । শাস্তি হিসেবে ।

এক বিখ্যাত ভারতীয় প্লেয়ারের বংশধর হিসেবে ; ঐ মানবসন্তানের নামে নাম হওয়া এক বাড়ির-- ও কেয়ারটেকার ।

একই রক্ত ওর দেহে বলে, অনেক লোক বাড়ির সাথে ওকেও দেখে যায় । এই দুনম্বরী করতে ওর মন চায়না কিন্তু সে নিরুপায় !

সবাই বলে যে হিটলারের চেলার শাস্তি পাওয়া উচিৎ আর এই কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়লে জেল হতেও পারে । কাজেই আরো বেশি শাস্তি পাবে সে তখন । আর এটাই সে ডিসার্ভ করে । তবে ওরা তো নির্মম নয়, তাই ওকে গ্যাস চেম্বারে দিচ্ছে না কেউ । সাজা কেটে সুস্থ জীবনই পাবে ।

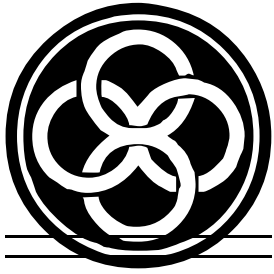

মেঘ কালো

দিনের শেষে, নিজের ঘরে ফেরে- ফেরিওয়ালা জাভেদ ।সারাটাদিন ফেরি করে ব্লাব্ব , মোম, টুনি লাইট আর আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ ।

শহরের একটু দূরেই তার ভাঙা ঘর ।

দিনশেষে সে ঘরে ঢোকে যখন- তখন বাইরে আঁধার নেমেছে । খোলা বারান্দা দিয়ে আসে, অল্প আলোর ঝিলিক । ল্যাম্পপোস্টের ধার ঘেঁষে ।

সারাটা দিন খাটা-খাট্নি করে আসা মানুষটি, সস্তার কফিতে চুমুক দেয় । এখানে বেশিরভাগ মানুষই কফিপান করে । খাওয়া হলে, কাঁধে একটি বড় ঝোলা নিয়ে বার হয় বনপথে । এই বনে হিংস্র পশু নেই ।

অনেক ক্যাঙারু আছে । তারা মরে পড়েও থাকে পথ-মাঝে । মোটর গাড়ির ধাক্কায় কিংবা লরির স্পর্শে । এইসব পশুর দেহ কিছুদিন পড়েই থাকে । পরে তাতে পচন ধরে । অনেক পাখিও মরে পড়ে থাকে বনপথে ।

প্রায়ই পার্শ্ববর্তী ঝোরায়, ভেসে আসে অন্য পশুর দেহ ।হয়ত ডুবে গেছে কোনো কারণে । অথবা পা ফস্কে ঝর্ণায় পড়েছে ।

মৃত পশু, কাঁধে তুলে নিয়ে যায় জাভেদ ।

গো-মাংসের অনেক দাম !!!

আপাততঃ এইসব মাংস আর সস্তার পাউরুটি খেয়ে জীবন কাটাবে । যতদিন না সে সুখের মুখ দেখে !

ওদের দেশের এক মেয়ে, নাম নাসিমা ; যাকে ও আজকাল সখী বলে- সে এখন ওর বাড়ি আসে, রোজ সন্ধ্যায় । আগে ওকে ইংরেজি পড়ায় । পরে দুজনে একসাথে মৃত পশু সংগ্রহে যায় । চাঁদনী রাতে অথবা ঘোর অমাবস্যায় !

জাভেদ যেসব আলো ফেরি করে , তার যোগান দেয় লোকাল এক চ্যারিটির মানুষেরা । বিক্রির -অনেকটা পয়সাই যায় সেখানে । তাই জাভেদ আর ধনী হতে পারেনা । এরকম গুচ্ছ,গুচ্ছ জাভেদ আর শাখাপ্রশাখায় নাসিমারা- বেঁচে আছে শহরের কোণায় কোণায় । কারো দয়া অথবা করুণায় !

নাসিমা প্রতিজ্ঞা করেছে- যে জাভেদের ঘরে সে আলোর বন্যা বইয়ে দেবে । দেবেই দেবে । তাই তো ওকে লেখাপড়া করায় । ভাবায় । যাতে সে পাড়ি দিতে পারে চাঁদে চড়ে, কৃষ্ণকালো অমানিশায় ।

পরদেশী

এই পরদেশী মানুষকে আমি প্রথম দেখি ; একটি ন্যাশেনাল পার্কের- ট্যুর গাইড রূপে । লাভারং ন্যাশেনাল পার্কে , অনেক নতুন ধরণের গাছ ও পশুর দেখা পাওয়া যায় , তাই সবাই যেতে আগ্রহী । লোকটির নাম রকি । আগেরদিন টিকিট বুক করে পরের দিন রকির দেখা পেলাম । ছোট একটি দশজনের দলে, রকি একা এক গাইড । আরেক ড্রাইভার আছে, নাম লরেন্স । লরেন্স তো খাস সাহেব, তা গায়ের সাদা রং দেখেই বোঝা যায় কিন্তু রকি আমাদের মতন ।

বাদামী । অনেক বয়স। মনে হয় দেখে । আসলে তত বয়স নয় । মধুমেহ রোগাক্রান্ত বলে, বেশি বয়স মনে হয় । অর্থাৎ একটু তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে গেছে । লোকটি নাকি বাঙালী ! খোদ শিবপুরের মানুষ । ওর মা ছিলো ভারতের লোক আর বাবা হল বিদেশী । আসলে বংশ অনুসারে ওরা নাগাল্যান্ডের মানুষ । অনেক আগে বৃটিশ যুগে ওদের পুর্বপুরুষেরা , সৈনিক হিসেবে বিদেশে লড়াই করতে যায় । নিয়ে যায় বৃটিশ সরকার । তাই এখন তারা সাহেব । আসলে নাগা প্রজাতির লোক । আর মা বাঙালী । মা ; নাগাল্যান্ডে বেড়াতে গিয়ে

ওর সাহেব হওয়া বাবার দেখা পায় । নাগাল্যান্ড নাকি অপরূপ । সেরকমই অরুণাচল প্রদেশ , মিজোরাম , মণিপুর এইসব জায়গা । ওর মা নাকি বলতো যে আমরা সুইজারল্যান্ড , অস্ট্রেলিয়া ছুটি কাটাতে যাই- অথচ নাগাল্যান্ড এক স্বর্গ যা হাতের কাছেই ।

ওর বাবা ওকে বিদেশে নিয়ে যায় । সেখানে পড়াশোনা করে । ভালো চাকরি করে । পরে ব্যবসা । অনেক টাকা করেছিলো । কিন্তু নাগাল্যান্ডে যায় নিজের শিকড়ের সন্ধানে । ওখানকার নির্মল জীবন দেখে- ওর হয়ত বুদ্ধদেবের মতন মনে হয়- জীবনের সংজ্ঞা কী ?

কত লোক পোভার্টি লাইনের নিচে আছে । অথচ সে একই ভাত, ডাল, তরকারির পেছনে কোটি টাকা ব্যয় করছে । সত্যি কি এতটা প্রয়োজন আছে ? ওর তো এনাফ আছেই । বাকিটা তো লাগছে না । বরং সেটার কারণে ; সেটাকে সংরক্ষণ করার জন্য অযথা স্ট্রেস

বেড়ে যাচ্ছে , হার্টে চাপ পড়ছে ! তাই ফিরে গিয়ে সে সমস্ত ব্যবসা বিক্রি করে- সমস্ত অর্থ দান করে দেয় নানান শুভ কাজে । মানুষের মুখে, হাসি আর শান্তি দেখে এক অদ্ভুত আরাম হয় । সুগার লেভেল ; যার জন্য আগে ইন্সুলিন পর্যন্ত নিতে হত তা এমনিই কমে যায় । অনর্থক দূর্ভাবনাও নেই । নিজের সামান্য খরচ এই গাইডের কাজ করেই মিটে যায় । স্ত্রী জীবিত নেই

। সন্তানেরা, যে যার নিজের জগতে আছে । তারা ভালোভাবে মানুষ হয়েছে। নিজেদের নিয়েই আছে !

বুড়ো ; কপালে চন্দনের প্রলেপ লাগায় । সুবাসিত হয় ট্যুর ! সাহেবরাও পছন্দ করে সেটা । জানালো যে এই বনে আছে- দ্রোণম্ নামে এক বিরাট গাছ । দুনিয়ার সুউচ্চ গাছগুলির মধ্যে অন্যতম ।

এক পর্যটক বলে ওঠে :: রকি শুনলে মনে হয়না এই নামের মালিকের এত গভীরতা আছে । মনে হয় চটুল কেউ একজন !

রকির আসল নাম -তাহরিং ফোম্ । তার মায়ের নাম সুনন্দা ধরচৌধুরী । বাবা রজার ফোম্ । ধর্ম , খ্রীস্ট ধর্ম ।যীশুর উপাসক । আমার সঙ্গে ভালো বন্ধুত্ব হয়ে

গেছে । ভালো মানুষ একজন । তবে একটু দোষও আছে। বড্ড পার্সোনাল কোয়েশ্চেন করে !!!

মধুমালাই

মধুমালাই একটি ছোট গ্রাম।

সেই গ্রামে থাকে এক সাহেব। নাম তার মাইক। মাইক এসেছিলো, সুদূর ডেনমার্ক থেকে। ভারত ; অসম্ভব ভালো লেগে যাওয়াতে সে আর ফিরে যায়নি। ছেড়েছে নিজের চাকরি। কাজ করতো সফট্ওয়্যারে।

ভালো আয় করতো। ছিলো এক বান্ধবীও, যার সাথে প্রায় দশবছর ছিলো। ওদের দেশে, ১২বছর হল অ্যাভারেজ বিয়ে টিঁকে থাকার সময়। ও বিয়ে না করেই ওর বান্ধবী লায়লার সাথে এতদিন ছিলো একত্রে। লায়লা বড় ভালো মেয়ে। তবে ওর একটু মানসিক সমস্যা শুরু হয়। ইদানিং এত ব্লাস্ট ইত্যাদি হওয়াতে ওকে অফিসে ও দোকানে-বাজারে অনেকে জিজ্ঞেস করতো যে পরের ব্লাস্টটা কোথায় হবে কিংবা ওর ইসলামত্ব নিয়ে ও লজ্জিত কিনা ! লায়লার খুব দু:খ হত। তাই মাইক বলতো :: আমাদের উচিৎ একজন

করে অন্তত: মুসলিম মানুষকে জড়িয়ে ধরে বলা- যে আমরা তোমাদের বিশ্বাস করি ।

মুসলিম দেখলেই মাইক বলতো :: কাম্ অন্ , গিভ মি আ হাগ্ !!

সেই মাইকের বিচ্ছেদ হল লায়লার সাথে । আউট অফ্ সাইট , আউট অফ্ মাইন্ড আর কি ! লং ডিস্টেন্স রিলেশান যাকে বলে ।

মাইক আর নারীসঙ্গ করেনি । এখন পশুসঙ্গে ব্যস্ত ।

মধুমালাই গ্রামে একটি পশুশালা খুলেছে যেখানে ফেলে দেওয়া পালিত পশু অথবা নিছকই পথপাশের পশুদের রাখা হয় । এই সংস্থার জন্য রাস্তায় একটিও কুকুর নেই । নেই জলাতঙ্কের ভয় এই এলাকায় !

এছাড়া তাড়িয়ে দেওয়া বাঁদর , ঘোড়া, ছাগল সবই দেখা যায় ওখানে । **সংস্থার নাম আনলিমিটেড্ লায়লা** । মাইক বললো- যে সে যখন এখানে থাকার সিদ্ধান্ত নেই, তখন তার জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ডিসিশান নিতে হয় । সাথী , চাকরি , দেশ সব ছাড়তে হয় । ফার্স্ট ওয়ার্ল্ডের সুবিধে ছেড়ে ; এই তৃতীয় বিশ্বে- একেবারে নি:সঙ্গ ও অর্থ, বিলাসহীন জীবন যাপন এক বিড়ম্বনা হয়ে দাঁড়ায় । তবুও রাস্তার অসহায় কুকুর ছানাকে দেখে- যার রূপালি লোমগুলি ক্লিন না করায়

হয়ে গেছে হলুদ -কারণ মালিক তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, সেই কুকুরকে সবাই লাথি ও লাঠি মারছে - কুকুরটা কেঁদে কেঁদে মরছে, কেউ তাকে একটা বিস্কুটও দিচ্ছে না । অথবা ঘোড়াটা , যে মালিকের জন্য সব দিতে পারে- আজ শুকিয়ে গেছে । কারণ মালিক মরে গেছে তাই সে অনাথ ; এদের কথা মনে করে মাইক ভাবে, সে ফিরে গেলেও সুখী হবেনা । মনের ভিতরে সবসময় এই কাঁটা বিঁধে থাকবে যে সে এক স্বার্থপর মানুষ । এসব দেখেও সে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ! তাই একটি কড়ির ভরসা না থাকলেও, মোহরের ভান্ডার না পেলেও সে এখানে থেকেই যায় । লায়লার নাম দিয়ে এই পশুশালা খোলে ---- আর আশ্চর্যজনক ভাবে, অর্থ এসে যায় প্রয়োজনের সময় । হয়ত লক্ষ-কোটিতে নয়, হয়ত সাতদিন ধরে নয় কিন্তু যখন আসে তাতে নিত্য প্রয়োজন ও সংস্থা চালাবার খরচ মিটে যায় । এক মিরাকেল হয় আর কি !

আমার আবার টাকা বিলিয়ে দেবার স্বভাব আছে । তাতে আমি মাঝে মাঝে চূড়ান্ত আর্থিক টানে থাকি তবুও স্বভাব যায়না মোলে ! আমিও কিছু দান করে একটু ইগো দেখাই যে আমি কতনা সৎ ও ভালোমানুষ ! মনে মনে ভাবি :: আচ্ছা, নেক্স্ট অভিজাত কফিশপের কাপুচিনোটা- নাহয় খেতে কয়েকদিন দেরী হবে !

এই পশুশালা দেখে আমি অবাক ! ভারতের মতন দেশে, এরকম বিদেশী কায়দায়- রাস্তার পশুর সেবা করা, এক সুন্দর কনসেপ্ট ! অভিনেত্রী দেবশী রায়েরও এরকম একটি সেবা সংস্থা আছে । রাস্তার কুকুরের জন্য ।

এদেরকে আমি খুব ভালোবাসি ।

যারা নিয়মিত হাসিকান্নার বাইরে কিছু করেন বা ভাবতে পারেন তাদের না ভালোবেসে পারা যায় ?

মনিরা

মনিরা ; জন্মগত দিক্ থেকে এক জার্মান নারী যে থাকে ভারতে । গরম শহর দন্ডহরিতে । আসলে জার্মানি থেকে ভারতে আসে কাজে । কিন্তু ফিরে যেতে সক্ষম হয়না । পুলিশ ওকে ধরে, ড্রাগস্ চালানের ব্যাপারে । ওর বক্তব্য- যে কেউ ওর সাথে ছলনা করেছে । ওর ব্যাগে এগুলো দিয়ে দিয়েছে । কিন্তু পুলিশ প্রমাণ করে দেয় যে সেই দায়ী । ঘটনা যাইহোক্ না কেন, মনিরা আর ফিরে যায়না । আসলে দেশে ওর কেউ নেইও । কুমড়ো চাষী ছিলো ওর বাবা । এক একটা কুমড়ো নাকি ছোট সোফার সাইজের , এত্তো বড় । সেই খামারবাড়িতে বেড়ে ওঠে মনিরা আর তার তিন সৎ-ভাই । ভাইদের সাথে সম্পর্ক নেই । মা শৈশবেই গত হয়েছে । বাবা পরে আবার বিয়ে করে । সেখান থেকেই ভাইয়েরা হয় । সৎ-মায়ের সাথেও যোগাযোগ নেই । এই গ্রামে আসে, কুসুম নামক এক জেলের কর্মীর সাথে । এটা ওদের গ্রাম । মনিরা এখানে গোয়ালে কাজ করে । ওদের খামারবাড়িতে

করতে অভ্যস্থ ছিলো । দুধ দোয়ানো , খড় ইত্যাদি নড়াচড়া করা- সবই পারে । এখন গোয়ালে দুধ কেনাবেচাও- করছে ।

ও ভালো ইংলিশ পারে এখন , আগে কেবল জার্মান আর অল্প ফ্রেঞ্চ-ভাষা জানতো । এরকম কুঁচবরণ কন্যা, যার স্বর্ণকেশের বাহারে মুক্ত ঝরে পড়ে , টুপটুপ করে পড়ে হীরা , মণিমানিক্য সে একবার কেন দশবার জেলে গেলেও লোকের নয়ণের মণি হতে পারে । **নীলনয়না , গ্লামারস্ এই গোয়ালিনীকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি । আমি দেখেছি তার সমাধি !**

দন্ডহরির এক বাগানে । সেই বাগানের পাশেই এই মেম গোয়ালিনীর গোশালা ছিলো । মানে এখনও আছে , মালিক- মনিরাকে শ্রদ্ধা জানাতে পাশের বাগানে ওকে সমাধিস্থ করে । আসলে পরে ও একজন দুগ্ধ বিশারদ্ হয়ে ওঠে , জার্মান ইঞ্জিনীয়ারিং এর মতন- মিল্ক টেকনোলজিতে অসম্ভব পারদর্শীতা দেখিয়ে । মাদক দ্রব্যের মতন ; দুগ্ধ নেশায় ঢাকা পড়ে যায় দন্ডহরির

পথ । একধারে লাল, লাল কৃষ্ণচূড়া মোড়া পথ , সিঁদুর খেলায় মেতেছে আর অন্যপাশে সার দেওয়া গোয়ালগুলি ! যেখানে কাজ করতো ভিনদেশী এক কনভিক্ট ! সাদা রং, জাতে মেমসাহেব আর মনে অশেষ করুণা নিয়ে ।

মনিরাকে নাকি কেউ কোনোদিন দুধে জল মেশাতে দেখেনি। কনভিক্ট /অপরাধী, হওয়া সত্ত্বেও।

শিস্

বুড়ো মানুষ রাখাল ; ঠিক রাখাল রাজার মতনই গুণী ।

রাজহাটের মানুষ এই বৃদ্ধ- শিস্ শিল্পে নাম কিনেছে । দেখলে মনে হবে কোনো মিস্ত্রি ! সাজগোজ নেই , পরিচ্ছন্নতা নেই কোনো । নেই কোনো বাহুল্য । নেহাৎই সাধারণ রাখাল দাস, শিস্ দিয়ে গান করতো কৈশোর থেকেই । বিড়িতে টান দিয়ে, শিস্ দিতে দিতে কাজে যেতো । ওর বাবা রাজমিস্ত্রি ছিলো- তাই ছেলেকে কৈশোর থেকেই কাজ শেখায় । ছেলে বড় হয়ে বাবার মতন বাড়ি বানাবে ! এই আশায় । কিন্তু নেশায় পেয়েছিলো রাখালকে । শিসের নেশা । শিস্ দিয়ে দিয়ে, গোটা গানটাকে খুব মনোরমভাবে কি করে গাইতে হয় সব শেখে এক মাস্টারের কাছে । বদলে ফ্রিতে তার বাড়ির রাজমিস্ত্রির কাজ করে দেয় সে ও তার বাবার দল । মিস্ত্রির দল । সেখানে আদিবাসী

ছেলে ফাগুন ছিলো, মেয়ে মতিয়া ছিলো , এক বৃদ্ধা নানী কাজ করতো , মোশারফ্, জুগনু , সাম্‌রা আর খুশবু ছিলো । সবাই মিলে বাড়িটা বানিয়ে দেয় ।

বদলে শিসের ব্যাকারণ জেনে নেয় ।

রাখালের বাড়িটা ; ক্যাটক্যাটে নীল রং এর । তিনখানি ঘর নিয়ে বাড়ি । জানালাগুলো কমলা আর দরজা কে জানে হয়ত হলুদ ! উজ্জ্বল হলুদ । অথচ তার ভেতর থেকেই ভেসে আসছে সুরেলা শিসের শব্দ !

ময়লা পোশাক পরা, এক ছায়ামানুষের কন্ঠ থেকে । ওর স্ত্রী সুন্যায়না ; একটি স্টিলের প্লেটে কিছু মোয়া আর প্লাস্টিকের বাটিতে ঘুগনি সাজিয়ে দেয় আমায় ।

আমি এক্সট্রা চা চাই । ক্লাস ওয়ান থেকেই চা পানে অভ্যস্ত আমি । চা/ কফি নাহলে আমি মরে যাবো !

সুন্যায়না , আমাকে আকন্ঠ চা ভরে দিলো । আদা চা । সুন্দর আদার গন্ধ তাতে । রাখাল শিস্ দিয়ে গান করছে ! বাজিরাও মস্তানির গানগুলো একে একে করছে । আর ওর মস্তানি, দূর থেকে ওকে পর্যবেক্ষণ করছে ! কারণ ওর আজকাল মাথা ঘুরে যায় । প্রেসারের সমস্যা আর কি । সুন্যায়না ; তার

একজোড়া সুনয়ন দিয়ে, স্বামীকে নজরে রাখছে । ব্যাকগ্রাউন্ডে রাখাল রাজার বাঁশি নয় ; শিস্ ! ছেলেবেলা থেকেই শিসের গান শুরু হয় । বাড়ি তৈরি করতে করতেও শিস্ দিয়ে গান করতো । নিছক মেয়েদের দেখে শিস্ দেওয়া নয় বলেই এও এক কলার সম্মান পেলো পরে ।

একে তুমি সিনেমার রোমান্টিক সিন্ ছাড়া কী বলবে ?

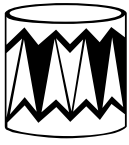

বিষ্ঠা

রজত আইচ এক আজব মানুষ । বিদেশে অনেকদিন আছে । হাফ্ সাহেব হয়ে গেছে । মাথায় টাক্ পড়েছে । ভুঁড়িও হয়েছে । আইচ সাহেব , বিদেশে এক অন্যধরণের কাগজের কল খোলে ।

ওম্বাট্ বলে একপ্রকার জীব হয় । মাঝারি সাইজ , ছোটখাটো ভাল্লুকের মতন খানিকটা- বলা যায় । সেই পশুটি চতুষ্কোণ / স্কোয়ার আকারের বিষ্ঠার জন্ম দেয় । সেই বিষ্ঠা এবং গোমল, ক্যাঙারুর মল, ঘোড়ার মল ইত্যাদি নিয়ে আইচবাবু ,এই আশ্চর্য কাগজের জন্ম দেয় । কাগজের এখন খরা । গাছ কাটা নিষেধ । তবুও এই অভিনব উপায়ে সৃষ্ট কাগজ নিয়ে কারো কোনো কৌতুহল নেই । কারণ এর জন্মদাতা হল পরিত্যক্ত মল , বিষ্ঠা । তাই শুভ কাজের বা বিদ্যার জন্য নির্মিত কাগজের ক্ষেত্রে এই জাতের পেপার ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়েছে, আমাদের টেনটুলা দেশে । আপাততঃ কাগজ তৈরি বন্ধ আছে । আইনের চেয়েও

লোকের সেন্টিমেন্ট বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে । দেখা যাক্ অদূর ভবিষ্যতে কী হয় !

আপাততঃ রজত আছে এক ছোট গ্রামে ।

নিজ পরিবারকে ছেড়ে এসেছে । তার আয়ু নাকি মাত্র দুবছর । বেদনায় ,অতিরিক্ত মদ্যপানে লিভারে ক্ষত । ক্ষতবিক্ষত লিভার ট্রান্সপ্লান্ট করতে বলেছে কিন্তু রজত আইচ এর মতে, অন্যলোকের দেহের অঙ্গ নিয়ে বেঁচে থাকার কোনো ইচ্ছে তার নেই । যতদূর এসেছে ভাঙা যকৃত নিয়ে, তাতেই সে খুশী । কেবল বিষ্ঠা থেকে কাগজে রূপান্তরিত হওয়া পেপারসারি যা ঈষৎ সবুজ রং এর ; দেখে যেতে পারবে না হয়ত ।

সব স্বপ্ন সফল হয়না । তার একটা হয়েছে । এই অভিনব কাগজ প্রদান , মানব সমাজকে । হয়ত এখন না হলেও পরে কখনো এই কাগজ আদৃত হবে ।

আইচ সাহেবের জীবনে আরো একটি চমক আছে । বেশিদিন আর আয়ু নেই শুনে ভদ্রলোক তার প্রথম প্রেম জয়তীর কাছে ফিরে গেছে । জয়তীও বিদেশে , তবে অন্য এক গ্রামে থাকে । তার স্বামী নেই । বিয়েই করেনি আসলে । বলে :: কেন মেয়েরা একা থাকতে পারেনা ? কী অসুবিধে ? একজন পুরুষ যা পারে তা

মেয়েরাও পারে । কেবল নিজের মনটাকে একটু হাল্কা করতে হবে ।

জয়তী এই গ্রামে, বয়লারের পার্টস্ তৈরি করার অফিসে কাজ করে । ভারত থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে আসে । রজতের সাথেই পড়তো । রজত কেমিক্যাল আর জয়তী মেকানিক্যাল । বিয়ে হয়নি সেই অতীব প্রাচীন জাতপাত এর কারণে ।

এখন সবাই ওকে বলছে :: শেষবয়সে রজতকে কোথা থেকে জোটালে ? তুমি খুব লাকি যে ফার্স্ট ফ্লেমকে পেয়েছো আবার । এক্স ফিরে আসছে ; সত্যি দারুণ ঘটনা ---ইত্যাদি ।

জয়তী , বয়লার বা চুল্লি ছাড়া যার জীবনে এখন আর কোনো মধুরতা নেই সে কাগুজে মিষ্টি হেসে বলে :: এ হল বয়লারের স্পেয়ার পার্টস্ !! আলাদা করে রাখা ছিলো মনের স্টেফনিতে !!

রজতের আয়ুর কথা ভেবে ওর স্ত্রী উদরতা দেখিয়েছে । আপত্তি করেনি ছেলেমেয়েরাও । কাজেই প্রথম ও মধ্য নাহলেও ; শেষ জীবনেই রজত আইচ ফিরে গেছে তার প্রথমার কাছে ।

সবারই এমন কপাল হলে, দুনিয়ায় হয়ত আর একটুও যুদ্ধ থাকতো না । কী বলেন ? বুকে, কত বড় বড়

ক্ষত নিয়ে আমরা বেঁচে থাকি তাইনা ? পুরানো সেই দিনের কথা মনে হলে, বোঝা যায় তখনও হৃদয়ে ক্ষত- কতটা ।

রজতের আরো একটি বাসনা আছে । ভারতের প্রখ্যাত জৈন তীর্থক্ষেত্র মুক্তোগিরিতে যাবার । সেখানে নাকি চন্দন ও কেশরের বৃষ্টি হয় আকাশ থেকে , পূর্ণিমা এবং আরো বিশেষ বিশেষ দিনে । দেখা যাক্ সেই **ইচ্ছেটা পুর্ণ হয় কিনা !!! প্রথমাকে নিয়েই তো এইসব স্বপ্ন দেখা ! হাফ্ বেকড্ যৌবনে ।**

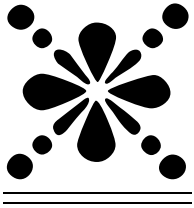

র‍্যাডিক্যাল

এই গল্প এক আশ্চর্য বাঁদরকে নিয়ে । হৃদয়পুরে, উঁচু আর নীচুজাতে সবসময় গোলমাল হয় । কে কাকে ছুঁয়ে দিলো কিংবা কার দালানে, কোন মানুষের ছায়া পড়লো তাই নিয়েই সরগরম , এলাকা । সরকার যে সমস্ত কল তৈরি করেছে, সেগুলি থেকে ছোটজাতের লোক জল নিতে পারেনা । তাদের পুকুরের জল দিয়ে রান্না করা ইত্যাদি করতে হয় । সেই পুকুরেও নোংরা ফেলে উচ্চজাতের লোক । কাজেই দুই-পক্ষের মারপিট্ লেগেই থাকে ।

বাঁদরের নাম জিমি । শুনলে মনে হয় কোনো সারমেয় ! এই জিমি এক আজব পশু । নামেই সে বাঁদর ! আসলে মানুষেরও ওপরে সে বিচরণ করে । মন্দিরে ; ঠাকুরের গলায় ফুলমালা দেয় । ওকে কেউ খাবার

দিলে ও কোনো শিশুকে দিয়ে দেয় । সে না খেলে ও নিজে খায় ।

বাঁদরটিকে --পিকনিকেও দেখা যায় । সবার মধ্যে বসে ছবি তুলছে । সেল্ফি তোলার সময়, সেখানে উঁকি মারছে অথবা নিছকই রান্নার জায়গায় গিয়ে সবার সাথে প্রাত:রাশ সারছে । ভালোবাসে নিরামিষ খেতে । মিষ্টিটা একটু বেশি ভালোলাগে ওর । আর ইলিশ মাছ ও ডিমের কুসুম তো দারুণ লাগে । ওমলেট্ দেখালেই মুখটা- বেঁকিয়ে থাকে । যেন বলতে চায় যে কুসুমটাকে একেবারে গলিয়ে নিয়ে এলে ?

সেদ্ধ ডিমের বিশেষ ভক্ত । আর চুরি করে বা কেড়ে খায়না । মর্কট হলেও কর্কট নয়- তাই বিষের জ্বালা নেই । রাতে ফুটপাথের বেঞ্চে শুয়ে ঘুমায় ।

কেউ জলে ডুবছে দেখলে তাকে তুলে আনে । আর কলের জলে আজকাল আর উচ্চজাতের মানুষ পুরো ১০০ ভাগ দাঁত-নখ বসাতে পারেনা । কারণ সেই জিমি ! ও ; অন্যায্য ভাবে কেউ জল নিলে বা একই লোক বারবার জল ভরতে থাকলে , তার মাথায় এক চাটি মেরে তাকে সরিয়ে দেয় । জিমি নিজেই দুটি লাইনের চল শুরু করেছে । কী করে বোঝে কে জানে সে-- সত্যিকারের যাদের জলের দরকার তাদেরকেই আগে দাঁড়াতে দেয় । এই অলীক বাঁদরকে দেখে মানুষ হয়ত

ভাবে যে এই রূপেই আমরা বেশি সজাগ ও সচেতন ছিলাম । এই বাঁদর জিমি সব খায় । আমিষ খায় তবে নিরামিষ বেশি ভালোলাগে ওর । বিশেষ করে মিষ্টান্ন ।

একটি বাঁদরের দৌলতে এলাকার নীচুজাত ভালই আছে । ইচ্ছেমতন জল নিতে পারে ওরা এখন ।

একদিন জিমিকে ঢিল মেরে কেউ ক্ষতবিক্ষত করে দেয় । ওর এক সাথী মারা যায় । সেই সাথীকে ঘাড়ে করে নিয়ে জিমি সোজা যায় হাসপাতালে । তবুও তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়না । তখন তাকে কবর দেবার আগে সে যায় বিডিও-র অফিসে । মহিলা বিডিও ; পুষ্পিতা মালাকার নিজে গিয়ে সেই লোকটিকে শাস্তি দেয় । প্ল্যান ছিলো প্রাণে জিমিকে মেরে ফেলা । কিন্তু ওর খাবারে বিষ মেশাতে গিয়ে ধরা পড়ে মংলু নামে এক মানুষ । তার হাত থেকে পাত্র কেড়ে নিয়ে মাথায় সজোরে এক চাটি মারে জিমি ।

পরে ওকে ঢিল মারা হয় । ও জখম হয় । পুষ্পিতা সব জেনে জিমিকে নিয়ে সেই লোকটির বাসায় হানা দেয় । মোড়ের মাথায় তাকে দাঁড় করিয়ে বেত মারা হয় । মারে এলাকার সমস্ত শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ । রক্ত-

মাংসের মানুষ নয় , এক অলৌকিক, জাদুকর মর্কটের জন্য ।

ইদানিং ওদের বিডিও অফিস থেকে মানুষ অফিসার বদলি হয়ে চলে গেছে । সরকারকে আর অন্য অফিসার নিয়োগ করতে হয়নি । কারণ গদিতে বসেছে জিমি । এমনি এমনি নয়, রীতিমতন সবার ভোটে জিতে !

ঐ দেখো ! জিমিকে নিয়ে উল্লাসে মেতে উঠেছে লোকেরা । ভোটদাতারা । জিমিও নাচছে, বাঁদর নাচন নয় , মানুষের নাচ --একেবারে ঐশ্বর্যের গানের সাথে ::: নিম্বুরা নিম্বুরা নিম্বুরা !!

<u>সত্যি ,বাঁদরের গলায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুক্তোর মালা শুধু মানায়ই না নতুন ফ্যাশানের সৃষ্টি করে ।</u>

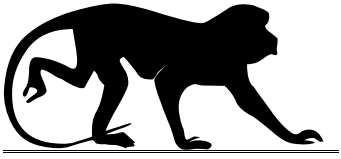

রাইকিশোরী

জানুয়ারি মাসেও কলকাতার অসম্ভব গরমে প্রাণ ওষ্ঠাগত রাইমার । বয়স প্রায় পঁচিশের কাছাকাছি , এলোচুল , টিকলো নাক অনেকটা মৃতা অভিনেত্রী মহুয়া রায়চৌধুরীর মতন দেখতে । সুন্দরী বলে একটু দেমাকও রয়েছে ওর । মেয়েটি অন্তর্মুখী । তাই দিনের অনেকটা সময়ই কাটায় নেটে বসে । বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা নেহাত-ই মন্দ নয় । সবাই ভার্চুয়াল বন্ধু । কেউ কেউ লুক্কায়িত , শুধু বৈদ্যুতিক তরঙ্গে জীবন্ত । কেউ কেউ বাস্তবে নেমে আসে । তেমনই এক বন্ধু সজল পান । নামটাই প্রথম আকর্ষণ করে রাইমাকে ।

রাইমার নাম ত্রিপুরার নদীর নামে । রাইমা আর সাইমা নদীযুগল ত্রিপুরার চিরসাথী । তার বাবা ছিলেন ত্রিপুরা সরকারের সার্ভেয়ার । জীবনের অনেকটা সময়

কেটেছে ঐ রাজ্যে । পরে কলকাতার বেহালায় এসে বাড়ি কিনেছেন । এখন ওরা ওখানেই বসবাস করে । সজলের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওরা দুজনে এক স্বর্ণালী সন্ধ্যায় বেড়াতে গেলো ভূটানঘাট । ডুয়ার্সের এই এলাকা বড়ই মনোরম । আগে থেকে বুক করা বনবাংলোতে এসে উঠলো দুজনে । এই প্রথম দেখা তো ! খুব সেজে এসেছিলো রাইমা ।

এমনিতেই সুন্দরী , চটকদার তার ওপরে সাজসজ্জা করে একেবারে রাজকুমারীটি ।

কিন্তু মিলন সমুদ্রের ঢেউ মনে এক আলোড়ন তোলে । যার কোনো সীমারেখা নেই । জ্বালা , তীব্র বিষের জ্বালা ! সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে খানখান ! দহন , দহনে টালমাটাল স্বপ্নের ভূটানঘাট ।

রাইমার রাজপুরুষ এক বৃদ্ধ । বয়স আন্দাজ ৫৫ । নাতিদীর্ঘ , থলথলে ভাব চেহারায় । দেখে মনেই হয়না ইনি লিখতে পারেন এত সুন্দর সুন্দর ই-চিঠি !

ভেঙে পরে রাইমা । মনের কষ্ট মনেই চেপে রাখে । সপ্তাহ-খানেক পরেও বাড়ি না ফেরায় পুলিশে খবর যায় । তদন্তে জানা যায় ভূটানঘাটের এক বনবাংলোয়

তাকে ধর্ষণ করে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে । পোড়ানোর আগে ছোট ছোট পিস করে ফেলা হয়েছিলো ।

বনবাংলোর ম্যানেজার জানান যে ঘটনার পরদিন রাতে এক বৃদ্ধ পর্যটক ,হঠাৎ তার জন্মদিন উপলক্ষ্যে বনবাংলোর বাগানে পার্টি দেন । সেখানে মদের ফোয়ারার সঙ্গে সঙ্গে আনলিমিটেড্ কাবাবের আয়োজন ছিল । এত কাবাব উনি কোথায় পেলেন কেউ জানেনা । অর্ডার দিয়ে বাইরে থেকে আনিয়ে ছিলেন ভেবেছিলো সবাই ।

আর কাবাবের স্বাদ ছিলো অদ্ভূত সুন্দর । শোনা যায় নরমাংস খুবই সুস্বাদু ।

ঝরা পাতা

আমি সুদূরের পিয়াসী । স্বেচ্ছায় হইনি হয়েছি বুকের ভেতরে এক জ্বালায় । আমি ছিলাম বাবা মায়ের এক মেয়ে , ঘোর কৃষ্ণবর্ণ , ঘোলাটে চোখ । তাই ছিলাম অনাদরের বড় অনাদরের । সকালের রোদ যেমন দাঁতহীন সেরকমই আমিও ছিলাম নিস্তেজ , বিবর্ণ ।

ছিল একটি সুন্দর সতেজ মন আমার । তাই নিয়েই বেঁচে ছিলাম আমি , ঐ কুৎসিত পরিবেশে । বাবা মায়ের বকা ঝকা , গালিগালাজ আমাকে কষ্ট দিলেও চুপ করে সব সইতাম । মনে মনে ভাবতাম একদিন হয়ত আমি ভালো চাকরি নিয়ে সুদূরে চলে যাবো আর এখানে আসবো না । আমার ভাইও খুব কালো কিন্তু ওকে বাবা মা কিছু বলতেন না ।

আমার যা রেজাল্ট তাতে করে আমাকে মেধাবী বলবেন সবাই । তাই হয়ত একদিন চড়ে বসলাম বিমানে । চললাম সব পেয়েছির দেশ আমেরিকায় , গবেষণার কাজে ।

আমার বিষয় জ্যোতির্বিজ্ঞান । গ্রহ নক্ষত্র আমাকে শান্তি দিতো । তারায় তারায় ঘুরে বেড়াতাম মাটিতে নামতে চাইতাম না । তাই বিদ্যার বিষয় বেছে নিলাম ঐ সাবজেক্টকে । গো প্লাস এষণা অর্থাৎ গবেষণার ফাঁকে ফাঁকে চলতো লেখালেখি । ভালো ভালো কবিতা ও গল্প লেখার চেষ্টায় জড়িয়ে পড়লাম অনেক ওয়েব পত্রিকার সাথে , লেখা দিতাম ছাপা হত কিংবা হতনা । কিছু একটা হত । অনেকে ভূয়সী প্রশংসা করতেন তাতে অন্যের হিংসা বাড়তো । এইভাবে আমি এগিয়ে চলতে লাগলাম । একদিন আমার বই বার হল একটি ওয়েবসাইট থেকে ।

খুব ভালো লাগলো । নিজে জড়িয়ে পড়লাম একটি অ্যাফ্রিকান ছেলে ভিভিয়ানের সাথে ।

ভিভিয়ান আমাকে খুব ভালোবাসতো । ওর আগের স্ত্রী লোর্ণা ওকে ছেড়ে চলে যায়নি , মারা গিয়েছিলো । ভিভিয়ান তারপর থেকে একলা । ভারি একলা ।

আমরা মিললাম সোস্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে । প্রথমে ওকে আমার খুব অহংকারী মনে হলেও পরে জানলাম বেশ ভালোমানুষ । আসলে নেটে তো মানুষ চেনা সহজ নয় !

এইভাবে আমরা বিয়ে করলাম । কিন্তু ভিভিয়ানও ধাপ্পা । ভীষণ ধাপ্পা ।

আমাকে চরম অপমান করতো । আসলে ও কোনো কাজই করেনা । খালি মদ খায় আর ড্রাগ্স নেয় । আমাকে কাজ করে ঘর দুয়ার সামলে চলতে হত তারপরে ওর মুড অফ হলে মারধোর দিতো আমাকে । আমার টাকায় খেলেও আমার কোনো স্বাধীনতা ছিলনা । এইভাবে আমি মুষড়ে পড়লাম । যেই বাড়িকে চিরতরে ছেড়ে এসেছিলাম সুদূর পরবাসে সেই বাড়িকেই আঁকড়ে ধরলাম । ভাই এলো বিদেশে । আমরা একসঙ্গে থাকতে লাগলাম । মায়ের সাথে ফোনে কথা হত । মনের বরফ গলে জল ।

দূরত্ব মনে হয় নিকটত্ব বাড়ায় । আর ছিলো চ্যাট রুম । তাতেই খুঁজে নিতাম আনন্দ ।

আবার পেলাম নতুন মানুষ তবে চ্যাটে নয় , পথে । যেতে যেতে বাসে । বেড়াতে বেশ ভালো লাগতো । একা একা চলে যেতাম নানান জায়গায় সেরকমই এক জায়গায় দেখা পেলাম সুব্রতর । সুব্রত খুব ভালো মানুষ । খাঁটি সোনা যাকে বলে । আবার ডুব দিলাম প্রেম অরণ্যে । আবার বিয়ে । এবার পাকাপাকিভাবে চলে এলাম দেশে , কেরালায় ।

সুব্রত বাঙালী হলেও অনেককাল কেরালায় ছিলো । ওর বাবা ছিলেন ওখানের ফিশারিজে ।

আমাদের একটি মেয়ে হল । নাম দিলাম আদিরা । আদিরা খুবই স্মার্ট মেয়ে ।

কালো হলেও একটা চটক আছে চেহারায় । দক্ষিণীরা দেখলাম কালো নিয়ে বেশ ভালো পরিমানেই হাসাহাসি করে । যেন মেঘ বেশি কালো না ভ্রমর !

আমার মেয়ে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হল । মন হল উদার , বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় গড়ে উঠলো চরিত্র ।

দৃঢ় , ঋজু । কিন্তু নদীর ওপাড় কহে ছাড়িয়া নি:শ্বাস !

হ্যাঁ এই বিয়েও সুখের হয়নি । একদিন ভ্রমণ করতে গিয়েই সব তচনচ হয়ে গেলো ।

আমরা গিয়েছিলাম সি -বিচে । সেখানে অর্ধ নগ্ন মহিলা দেখে দেখে আমার তৎকালীন স্বামী সুব্রত যেন কেমন হয়ে ওঠে ! চরম বেপরোয়া ও ইরেস্পন্সিবেল ।

একটি রোদপোয়ানো মেয়েকে ও ধর্ষণ করে ফেলে । তাতেই বিপত্তি । আবার আমি একা । আমি ওকে ক্ষমা করে দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু সুযোগ দেয়নি । আমার ওড়না দিয়ে ফাঁস লাগিয়ে ও হোটেলের ঘরে আত্মহত্যা করে । আদিরা আর আমি একদম একা হয়ে গেলাম ।

এইসব দেখে শুনে আদিরা বিয়ে করতে রাজি নয় । **ও সারাজীবন একা থাকতে চায় । ভয় পায় বিয়ে কে , কমিটমেন্টকে নয় , ভয় পায় বেড়াতে ।**

ঐ ঘটনার পরে আমরা দুজন আর কোথ্থাও বেড়াতে যাইনি । ছুটির দিনে আমরা ঘরে বসে লুডো খেলি কিংবা সুডোকু করি । একঘেয়ে লাগলে ওয়েবসাইট খুলে ভ্রমণ কাহিনী পড়ি । কিন্তু কোথ্থাও আর যাইনি । **মনে পড়ে যায় নির্মম ও ব্রতচ্যুত সুব্রতকে ,**

আমার , আমাদের মেয়ে , আমাদের আদর -আদিরার ।

††††††††††††††††††††††

the end